বাংলাদেশের নির্বাচিত কথাসাহিত্য : লোকায়ত ভাবনা

সঞ্জয় সরকার

বৃহৎ বনস্পতির শাখা-প্রশাখাগুলি অরণ্যঘন পরিবেশ সৃষ্টি করলেও, মাটির সঙ্গে শিকড় এক জৈবিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। যে বায়োলজিক্যাল থিয়োরিতে গোটা জীবজগৎ আবর্তিত ও প্রভাবিত; তেমনি দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা সাহিত্যের পূর্ণাবয়ব নির্মাণে প্রতিটি ভাবনার মধ্যেই ফল্গুধারার মতো বয়ে চলে ঐতিহ্য। "পল্লির ঘাটে মাঠে, পল্লির আলো বাতাসে পল্লির প্রত্যেক পরদে পরদে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে।"[১] শুধু পল্লি নয় নগরমুখী জীবন যাত্রাতেও মানুষের রক্ত অস্থি মজ্জায় লোকায়ত ভাবনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুগচেতনা যদি সাহিত্যের কাঠামো হয় আর তার ভীত শক্ত করতে ১৯৭১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে যে লোকায়ত ভাবনার বীজ রোপিত হয়েছিল—তারই সংক্ষিপ্ত ফলাফলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যেতে পারে।

দীর্ঘ সময় মহীরূহের নীচে থাকলে ছাল-বাকলের গন্ধ তো গায়ে লাগবেই—আর এই মাটির রূপ রস গন্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই ঔপন্যাসিকেরা তাদের সৃষ্টির মধ্যে কিংবদন্তী, স্থানিক, লোককথা, রূপকথা ও প্রচলিত লোকসমাজের ধারণাগুলিকে নিগূঢ় বন্ধনে শিষ্ট সাহিত্যের মধ্যে সহাবস্থান ঘটালেন। স্বকৃত নোমান (জন্ম—১৯৮০) তাঁর 'হীরকডানা' (২০১৩) উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভাটির বাঘ বীর বাঙালী শমসের গাজী। তাঁর অসামান্য বাহাদুরি ও রণকৌশল এত গৌরবান্বিত হয়েছিল যে তিনি বীর বিপ্লবী ডাকাতদলের সর্দার হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। তিনি কিংবদন্তী নায়ক তার সম্পর্কে জনগণের ধারণা—"সে রাতে ডাকাতদের সঙ্গে লড়ার সময় শমসের ও সাদুর সঙ্গে নাকি সিংহের সুরত ধরে ডজন ডজন জিনও শরিক হয়েছিল।" (হীরকডানা, পৃষ্ঠা-১৬)

আখতা রুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) এর 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র ভবানী পাঠক। তিনি সন্ন্যাসী আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তার অনেক অসামান্য কৃতিত্বের কাহিনী গুলিকে কেন্দ্র করে স্থানিক কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হয়েছিল যা বৈকুণ্ঠের চিন্তায় সেই ভাবনাগুলি ধরা পড়ে। মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে বারবেলায় ভবানীঠাকুর এসে বসেন পোড়াদহের মাঠের বটতলায়। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ সন্ন্যাসী পুজা শুরু হয়। পুজোর পর "সন্ন্যাসী মিলিয়ে যাবে আলোর মধ্যে আলো হয়ে।" (খোয়াবনামা, পৃষ্ঠা-১৬৩)। "....লোকায়ত সংস্কৃতি কালের ব্যবধানে কোনো জাতির শুধু আত্মমুকুব নয় ঃ সংগ্রামশীল চেতনার জন্ম দিতে পারে...."[২] কাৎলাহার বিলের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের মধ্যে মুনসি ভাবনার বীজ বিভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। "গোরাদের সর্দার টেলরের বন্দুকের গুলিতে সাদাঘোড়া থেকে পড়ে যায় মুনসি। গুলিতে ফাঁক করা গলা নিয়ে সোজা চড়ে বসল পাকুড় গাছের মাথায়। সেই থেকে মুনসি আগুনের জীব।" (পৃষ্ঠা-১৩, খোয়াবনামা)। মুনসি ভাবনার বীজ আরও গভীরভাবে তমিজের বাবার স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) তাঁর 'নাটাই' (২০০৩) উপন্যাসে এক রূপকথার গল্প শোনান আবেদালির ভাবনার মধ্য দিয়ে। বাড়ির পোষা গরুটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলে তার চিকিৎসার জন্য আহেদালি তার ছেলে আবেদালিকে নিয়ে যায়। অচেনা জায়গা বনজঙ্গল দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে পোহাদুর দাসীর কাছে শোনা রূপকথাটি মনে পড়ে যায়। রাজার ছেলে ফুলকুমার খুশিমনদের দেশে পৌঁছেছিল। পথে বটতলায় জিরোবার সময় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী কাছে শোনে যে, হাঁকড়াই রাক্ষস রাজকুমারী কুসুমবালাকে বন্দি করে রেখেছে। তৎক্ষণাৎ রাজকুমার মনপুরায় গিয়ে রাক্ষসকে হত্যা করে পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজকুমারীকে নিয়ে রাজ্যে ফেরে। দীর্ঘপথ হাঁটতে হাঁটতে শিশুমনে পঙ্খিরাজ ঘোড়ার ভাবনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

জলেশ্বরীর মিশনারী স্কুলের ব্রাদার জন দাস তিনি সপ্তাহে একদিন বিদ্যালয় ছুটির পর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গল্পের আসর বসাতেন। তেমনি একদিন একটি নীতিকথামূলক গল্প শোনালেন—"রাখালের পালে একশোটি ভেড়া ছিল, ঐ ভেড়াগুলির মধ্যে একটি ভেড়া ছিল খুবই দুষ্টু স্বার্থান্বেষী। রাখালবালক সমস্ত ভেড়াগুলি গুনে দেখে তার মধ্যে একটি ভেড়া কম। কিন্তু দুষ্টু ভেড়া জেনেও প্রাণের অন্তঃস্থলে বয়ে যাওয়া ভালোবাসা নিয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। আয়-আয়-আয় বলে ডাকতে থাকে। গল্পটি বলার শেষে জন দাস, সন্ধ্যাদি মবিনের চোখ ছল ছল করে ওঠে" (নারীরা, সৈয়দ সামসুল হক)

সেলিনা হোসেন (জন্ম—১৯৪৭) স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের মন-মানসিকতায় যে দুঃস্বপ্ন দেখা দিয়েছিল। সেই গুরুগম্ভীর পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্য "হোজ্জার ছোট্ট পুতুল" উপন্যাসে মোল্লা নাসিরুদ্দিন গল্পের ঝুড়ি নিয়ে হাজির হলেন। গল্পের শেষে পুতুলটি বলত—"গল্পটি ফুরাল/নটে গাছটি মুড়াল।" (হোজ্জার ছোট্ট পুতুল, পৃষ্ঠা-১২)।

একঘেয়েমি জীবনযাত্রা, সংসার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা পরনিন্দা-পরচর্চা—উপন্যাসের দীর্ঘপথকে নানাভাবে বিদ্ধ করে তার গতিপথকে শ্লথ করে তোলে। আর লেখক ঐ মুহূর্তে বাস্তবসমৃদ্ধ ভাবে রসের জোগান দেন ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। তা যেন শিশুর বাৎসল্যরস, কচিমুখের হাসি প্রাণ ভরিয়ে দেওয়া শরতের শুভ্র মেঘ। লোকছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা-গীতিকা ও রঙ্গরসিকতা পূর্ণ গানগুলির মধ্যে তার প্রমাণ মেলে।

'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) উপন্যাসে গ্রামে গ্রামে ছড়া কেটে গান শুনিয়ে বেড়াতেন কেরামত আলি। তাঁর মুখে পারিবারিক সম্পর্কের ছড়াটি হল—

"আমার শ্বশুর গেছে তার শ্বশুরবাড়ি।
আরে, শ্বশুর গেছে শ্বশুরবাড়ি
শ্বশুর বাড়ির পানসুপারি
দাঁত নাই তাই খাইতে নারি
মুখেতে মারো হামান দিস্তার বাড়ি।" (পৃষ্ঠা-১৫৫)

লোকসংস্কৃতি ছুৎমার্গ ত্যাগ করে সাহিত্যের ভুবনজোড়া প্যাভিলনে নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখেছে কালের ধারায়। নির্দিষ্ট কোনো প্রথাগত গণ্ডির মধ্যে আজকে তাকে আর বন্ধ করে রাখা যায় না। তাই মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন রাজাকারদের দমন পীড়ন নীতি সব স্মৃতিগুলি বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভাইরাল ফেবারের মতো প্রবাহিত। কোনো একক স্রষ্টা নয়, সমগ্রের হাতে সেই বীজরোপিত।

of class conflict ...

সময়োপোযোগী কিছু ছড়া, যা ঐতিহ্যের সূত্রে বাধা না থাকলেও এত প্রচার লাভ করে যে সেগুলি সার্ব্বজনীন ভাবনার দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়। তেমনি ইমদাদুল হক মিলনের (১৯৫৫) "কালোঘোড়া" উপন্যাসে মন্না, খোকা, কাদের ও আলম অত্যাচারী চেয়ারম্যান রাজাকারকে মেরে তারা শ্লোগান দিয়েছিল—

"জয় বাংলা জয়।" (পৃষ্ঠা ৫৫)

লোকছড়ার পাশাপাশি প্রবাদের মধ্যেও সমাজের চালচিত্র ধরা পড়ে। সৈয়দ শামসুল হকের 'নারীরা' উপন্যাসে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের চিত্র ধরা পড়ে। মকবুল ভাই তিনি বুড়ির চরের প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার অধরচন্দ্র ধরের না খেয়ে মরে যাওয়া এবং বর্তমানে সেই অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করে না; কেননা এখন অনেক বড়লোক হয়ে গেছে তাই শোনা যায়—

"রাতারাতি আঙুল ফুলিয়া তারা কলাগাছ" (পৃষ্ঠা-৪৬৭)

প্রবাদের দেশ বাংলাদেশ। তারই আলেখ্য ধরাপড়ে ইমদাদুল হক মিলনের বিভিন্ন উপন্যাসে। তিনি 'নূরজাহান' উপন্যাস ছুনুবুড়ির আধপেটা অবস্থায় পড়ে থাকা, না খেতে পাওয়ার পরিস্থিতিতে যে অভাবের চিত্র ধরা পড়েছে—

(ক) 'সেই দিন নাইরে নাতি
খাবলা খাবলা খাতি।' (নূরজাহান, পৃষ্ঠা-৭৭০)

(খ) 'পেটে খিদা লইয়া মান ইজ্জত দেহন যায়নি।' (নূরজাহান, পৃষ্ঠা-২৩)

মা হামিদা তার রূপবতীকন্যা নূরজাহানকে নিয়ে চিন্তায় পড়েছে। তাই তার স্বামী দবির গাছিকে বলেছে—